অধ্যাপক মাযহারুল হক স্মারক বক্তৃতা

জাতীয়তাবাদের অর্থনীতি

মোজাফ্ফর আহমদ *

বাংলাদেশের সংবিধানে যে চার মূলনীতির কথা উল্লেখিত আছে জাতীয়তাবাদ তার অন্যতম। জাতীয়তা নিয়ে নানা অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের অবতারণা হলেও জাতীয়তাবাদকে অন্য দুই মূলনীতির মত সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে বিসর্জন দেয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদ নিয়ে সাধারণ যে অজ্ঞতা তাহল একে স্বদেশপ্রেমের সাথে এক করে দেখা। স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রেম জাতীয়তাবাদের প্রকাশ, কিন্তু জাতীয়তাবাদের সমার্থক নয়। জাতীয়তাবাদকে সাধারণভাবে বলা হয় একটি জনগোষ্ঠীকে একাত্ম ও একত্র করার শক্তি ও সে শক্তির ভিত্তি তৈরিকারী দর্শন। একাত্ম একীভূত শক্তিই বিভিন্ন জাতীর জন্য প্রতিকূল পরিবেশেও অভাবনীয় কৃতিত্বের অর্জন সম্ভব করে তুলেছে। স্মরণ করুন জাপানের কথা, সেখানে উষর ভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন বিভিন্ন দ্বীপে নানা স্থানীয় অস্ত্রধারী দলগুলোকে একত্র করেছিল জাতীয়তাবোধ, তাদেরকে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে আজ এক বিক্রমশালী অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত করেছে তাদের অস্থিমজ্জায়স্থিত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশ প্রেম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও একটি পরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে জয়ের ফসল যা সম্ভব হয়েছিল বহুকালব্যাপী বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী সাধারণ মানুষের একাত্ম সংগ্রামের মাধ্যমে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য তাহল এটি আধুনিক কালের ইতিহাসে এমন এক সংঘবদ্ধ ও সংহত সুশৃংখল শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে যা জড়, ভাববাদী ও নিষ্ক্রিয় জনশক্তিকে অভাবনীয় অমিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে বারবার পৌছে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদ দ্ব্যর্থহীন আনুগত্যের কারণে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল ও ক্ষুদ্রস্বার্থবুদ্ধি পরিহারে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিশ্রুত মানবগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। কেবলমাত্র এ কারণেই জাতীয়তাবাদ একটি মানবিক আদর্শ যাকে বাঙালী দার্শনিক অরবিন্দ মনে করেছেন স্বাজাতিপ্রেম ও স্বদেশ প্রেমের মাধ্যমে মহান একক সৃষ্টিকর্তা ও সর্বনিয়ন্তার কল্যাণশক্তির মানব-মাধ্যমে প্রকাশ। অর্থশাস্ত্রের ইতিবৃত্তকার জর্জ সোল তার লেখায় বারবার বলেছেন বর্তমান উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিশীল ভূমিকা ছিল অপরিহার্য।

জাতীয়তাবাদ তাই উন্নয়নের পক্ষে একটি সহায়ক শক্তি। কিন্তু জাতীয়তাবাদকে কেবল শক্তি বলে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়, বলা উচিত জাতীয়তাবাদ মানবিক কল্যাণে একটি দর্শন না হলে এটি বিভাজান প্রক্রিয়ায় মানবগোষ্ঠী শক্তির অপপ্রয়োগের শিকার হতে পারে। যদি আমরা জাতীয়তাবাদকে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি হিসাবে একাত্ম জাতি-সত্ত্বা ও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলি তাহলে জাতীয়তাবাদ জাতিসত্ত্বার উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক বিকাশে একটি সচল সামাজিক শক্তির সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় সেজন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন সজ্ঞানভাবে জাতীয়তাবাদের ধ্বনাত্মক আদর্শকে পরিচর্যা করা যার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা

* অধ্যাপক ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সর্বস্তরের জনসম্পদের সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াশীল শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে তাদেরই বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়। সুতরাং কল্যাণমুখী জাতীয়তাবাদের প্রধান শর্ত হল এমন একটি সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ ঘটানো যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি জনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে ও তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বৃহৎ কর্মে নিয়োজিত করতে পারে। স্বদেশপ্রেম যদি ফাঁকাবুলি না হয় এবং সর্বজনের কল্যাণ ও প্রয়োজনে না আসে তাহলে রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না, কারণ বিভাজিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে সংঘাতময় দুর্বল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

যদি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র সৃষ্টি না হয় তাহলে বিশ্বকে সার্বভৌম রাষ্ট্রসত্ত্বার সমষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। আর জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রসত্ত্বার যদি আত্মিক ও নিজস্ব সংহত শক্তি না থাকে তাহলে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে তার অবস্থান দুর্বল হতে বাধ্য। এজন্যই আজ যখন উন্নত দেশগুলো তাদের রাষ্ট্রশক্তিকে সংহত রাখতে ব্যস্ত তখন তারাই উন্নয়নকামী তৃতীয়বিশ্বকে তাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এমন সব অবস্থায় নিপতিত করছে যে সংহত শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রসত্ত্বার বিকাশ এখানে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। মনে রাখা প্রয়োজন একজন দুর্বল মানুষের চাইতে একটি দুর্বল রাষ্ট্র অনেকবেশী অসহায়। ছোট হয়ে আসা পৃথিবীতে আজ যে তীব্র প্রতিযোগিতা নৃশংস আকার ধারণ করছে সেখানে আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রের অবস্থা অত্যন্ত করুন। একটি রাষ্ট্র আঞ্চলিক গোষ্ঠিভুক্ত হয়েও নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা পেতে ব্যর্থ হয়। কেবলমাত্র আত্মশক্তিশালী রাষ্ট্রই স্বদেশবাসীর মঙ্গল ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে যার ফলে রাষ্ট্রসত্ত্বা ও জাতিসত্ত্বা আরও শক্তিশালী হয় অন্যথায় এমন রাষ্ট্র হয় বিলীন হয় অথবা অন্যশক্তিশালী রাষ্ট্রের কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে টিকে থাকে। কোন সম্মানজনক জনগোষ্ঠীর জন্য এমন অবস্থা কাম্য হতে পারে না।

বাংলাদেশে আজ কি ঘটছে? এদেশ আজও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারে নি এবং যে জাতীয়তাবাদ এদেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী করেছিল তার বিকাশ বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণে পরিপূর্ণভাবে বিকাশিত হয়নি বলেই স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতিপ্রেমের আজ বড় ঘাঁটতি । ফলে এ দুর্বল রাষ্ট্র কেবল অপমানকর অবনত স্থান থেকে আরও অবনত স্থানে অপনত হচ্ছে। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমাদের পানির ন্যায্য অংশ আদায় করতে পারি না, আমরা পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তির নাগরিকের বোঝা বহন করছি, আমরা পার্শ্ববর্তীদেশ থেকে উদ্বাস্তুর বোঝা ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয়েছি। অন্যদিকে সাহায্যের ডালি নিয়ে যে সমস্ত দেশ ও সংস্থা এদেশে ক্রিয়াশীল, যারা আমাদের বন্ধু ও সহায়ক শক্তি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, তারাও আমাদের আত্মশক্তি সৃষ্টিকারী উন্নয়নের পথ থেকে বিচ্যুত করে তাদের দেশীয় স্বার্থের সাথে সাযুয্যপূর্ণ শর্তে আমাদের রাজী হতে বাধ্য করছে আর এ তৎপরতা চলছে এদেশেরই একদল সুবিধাবাদী সুবিধাভোগীদের সহায়তায়। এ সমস্তই ঘটছে যখন আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বলকারী নানা দেশী ও বিদেশী সংগঠন প্রকাশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। দুর্বলরাষ্ট্র ফিলিপিনের কেউ কেউ একে (সে দেশকে) উপনিবেশকারী যুক্তরাষ্ট্রের একান্নতম রাষ্ট্র হিসাবে চিন্তা করেন। তেমনি এদেশেও অনেকে এদেশকে অন্য কোন দেশের অংগ হিসাবে ভাবতে দ্বিধা করেনা। এটি আমাদের জাতিসত্ত্বা আজ কোন স্তরে পৌছেছে তারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কেবল হীনমন্যতার প্রকাশ নয়, এ আরও বাস্তবভাবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়ন সাধনে ব্যর্থতার বিমূর্ত প্রকাশ। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে অর্জিত স্বাধীনতার গর্বকে খর্ব করে বিভাজিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠি যখন চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় তখন জাতিসত্ত্বা হয় বিপন্ন। এটিই আজ কঠিন বাস্তব

যা এদেশের কল্যাণ ও উন্নয়কামী জাতীয়তাবাদীদের সজ্ঞানভাবে বোঝা দরকার। আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভরতার কথা দিয়ে বোঝানো হয় আমাদের উন্নয়নের জন্য এ নির্ভরতা দোষের নয়, কিন্তু পরস্পর নির্ভরতা যখন একমুখী হয় তখন সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় এবং জাতিস্বত্ত্বা বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং আত্মশক্তি যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মাধ্যমে, কল্যাণের মাধ্যমে, অংশিদারিত্বের মাধ্যমে একাত্ম করে সেটির অর্জন ছাড়া উন্নয়নের কোন বিকল্প এদেশে নেই এবং এটিই আমাদের জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এটি না হলে রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি হয় না কারণ রাষ্ট্রের শক্তি অস্ত্রে নয় বরং রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত আছে এর আপামর জনসাধারণের মিলিত সত্ত্বার মধ্যে।

যারা আজ আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেন তারা ইতিহাস বিস্মৃত। প্রকৃত অর্থবহ আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি হল স্বীকৃত ও শক্তিশালী জাতিসত্ত্বা আর সে জাতিসত্ত্বার ভিত্তি হল সমন্বিত সংহত একাত্ম ও উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠি। যে রাষ্ট্রে এমনি জনশক্তির বিকাশ স্তিমিত, স্তব্ধ বা অবরুদ্ধ সে জাতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কেবল অপমানকর অবস্থায় নিপতিত হয়। ইসরাইল, জাপান, সিংগাপুর, তাইওয়ান ইত্যকার রাষ্ট্রে এমনি জাতিসত্ত্বার বিকাশ ছাড়া বর্তমানের বিস্ময়কর উন্নয়ন সম্ভব হত না আর পরাশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভারবহনে ব্যাপৃত থাকলে এমনি জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ আজ হতমান, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব সম্পদশালী হয়েও দুর্বল। মনে রাখা দরকার সময়ের পরিমাপে আমরা আমাদের টিকে থাকার শক্তি অর্জন স্বল্পতম সময়ে না করতে পারলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। সীমাহীন বিলাসিতার ক্ষুদ্রদ্বীপগুলোর পাশে বিশাল বিস্তীর্ণ দরিদ্র জনসাধারণের যে জীবনধারণের গ্লানি ও বিদেশে অনিয়মিত ও অপমানকর অবস্থান তাতেও আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধারদের বোধদয় ঘটেছে বলে মনে হয় না। এজন্য সমস্ত জনগোষ্ঠিকে শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় জাতি ও রাষ্ট্রসত্ত্বায় রূপান্তরিত করতে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির কোন বিকল্প নেই, না হলে আমাদের মানবসম্পদ নষ্ট হবে, প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হবে। আমরা আজ বাংলাদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠির মানবেতর অবস্থানে সমগ্র ও বিনাশিত বিচলিত হতে দেখছি একটি ক্ষুদ্র দেশ বিদেশী শক্তির হাতে, তাতে আমাদের চেতনা আসেনি। আমাদের সরকার দুর্বল কারণ তাদের শক্তির মূল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মাঝে নেই, তারাও ঐ ক্ষুদ্রগোষ্ঠির প্রতিভূ। এ দুর্বলরাষ্ট্র তাই আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিধরের উপর নির্ভরশীল যারা বলছে তোমরা প্রশাসন জান না, যারা বলছে তোমাদের এখানে ঐ ক্ষুদ্রগোষ্ঠিকে আরও ক্ষমতাধর কর, যারা দরিদ্রকে কেবল সহানুভূতির কথাই বলে ক্ষমতাধরদের স্বার্থরক্ষার্থে কিন্তু তাদের শক্তিশালী প্রকৃত সৃজনশীল করে তোলার কোন কথা বলে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছে আমাদের বিশালজনগোষ্ঠির সংহত করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয়সত্ত্বার বিকাশের বিপক্ষে যাতে আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বসংস্থায় সম্মানজনক অবস্থান থেকে বঞ্চিত হই। তাহলে যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে তা হল এ দুর্বল অবস্থা ও দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ কি করে পাওয়া যায়। সেজন্য আমরা বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক দর্শন ইতিহাসের আলোকে বিচার করতে চাই।

দুই

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির ইতিহাস সুদীর্ঘ। আধুনিক জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টির সমসাময়িক। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দিতে এ দর্শনের সাক্ষাৎ মেলে। তখন পুরোনো সাম্রাজ্য ভেঙ্গেছে, নতুন সাম্রাজ্যবিস্তার শুরু হয়েছে, সামন্তবাদ ইউরোপে দুর্বল হয়ে অস্তিত্ব হারাচ্ছে এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ

শুরু হয়েছে। আরেক শতাব্দির মধ্যেই শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু এ সময়ই জাতি-রাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে ব্রতী হয় ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার আর ছোট শিল্পের বিবর্তন এর মাধ্যমে যথাসম্ভব সম্পদ সৃষ্টি ও সম্পদ সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় কৃষি কিন্তু অর্থব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হিসাবে বিরাজ করেছে যদিও বাণিজ্য ও শিল্প সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয়নের মূল শক্তি হিসাবে বিকশিত হয়েছে। শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজনেই বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাধান্য পেতে শুরু করে। উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে মূল্যবান ধাতু চলে আসত স্বদেশে, যাছিল দেশের সম্পদ ও সচ্ছলতার দৃশ্যমান পরিচিত। এ থকে যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব তার মূল কথা হল যত পার বিদেশে বিক্রয় কর কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশী পণ্য বিশেষ আসতে দিও না। অর্থাৎ বৈদিশিক বাণিজ্য করার মত উদ্বৃত্ত ও আকর্ষণীয় উৎপাদন ও দেশজ চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পণ্য দেশে উৎপাদন ছিল জাতি-রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রাথমিক তত্ত্ব। সুতরাং সরকার আমদানী পণ্য নিষিদ্ধ করতে, উচ্চ শুল্ক বসাতে এবং রপ্তানী পণ্যে ভর্তুকী দিতে সদাপ্রস্তুত ছিল। এ জাতীয় অসম বাণিজ্য প্রতিযোগী জাতি-রাষ্ট্রের বাধা অতিক্রম করতে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হত কিন্তু সামরিক শক্তি সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন ছিল উদ্বৃত্ত সম্পদ। অনেকেই কেবল উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের দিকেই তাদের আলোচনা সীমিত করেন, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ছিল শক্তিধর গর্বিত জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ মাত্র। এখানে স্মরণীয় যে এন্টনীও স্রাফা (১৫৮০-১৬৫০) এই বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধান্য ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। এ যুক্তিতে যে শিল্প, শ্রম ও কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে মূল্য সংযোজন করে এবং এর ফলে বহির্বাণিজ্য কৃষিপণ্যনির্ভরতার চাইতে অধিক লাভজনক হয় এবং দেশে উদ্বৃত্ত সম্পদ বেশী পরিমাণ ফিরে আসে যা রাষ্ট্রকে সম্পদশালী ও শক্তিশালী করে ও জনসাধারণের জীবনকে উন্নত করতে সাহয়তা করে। থমাস মান ছিলেন এন্টনীও স্রাফা সমসাময়িক। তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে রাষ্ট্রের উচিত বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা নেয়া। উল্লেখযোগ্য যে বৃটেনবাসী থমাস মান উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যারা মনে করেন বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত মতবাদ আজ বিগত ধারণা, তাদের স্মরণ করা উচিত জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপ-আমেরিকা এই বাণিজ্য সুবিধার তত্ত্ব আজও পরিহার করেনি।

ফ্রান্সে জাঁ বাপটিস্ট কলবের (১৬১৯-১৬৮৩) ছিলেন এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্য তত্ত্বের একজন সফল প্রবক্তা। তিনি একজন উল বিক্রেতার সন্তান, যাকে কার্ডিনাল ম্যাজ্যারাঁ তার বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। সেখানে কলবের এমন সাফল্য অর্জন করেন যে কার্ডিনালের সুপারিশে জাঁ বাপটিষ্ট সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর অর্থমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘকাল কাজ করেন। তিনি শিল্প ও বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, আমদানীর উপর উচ্চ শুল্ক বসিয়েছিলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিসাধন করেছিলেন, শ্রমিকদের কাজের সন্ধানে বিদেশ গমন বন্ধ করেছিলেন, বিদেশ থেকে সস্তা ও দক্ষ শ্রমিক আমদানী করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, একচেটিয়া ব্যবসার জন্য বাণিজ্য সংস্থা গঠনে সহায়তা দিয়েছিলেন, এবং উন্নততর উৎপাদন প্রক্রিয়া ও নতুন উন্নত পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করেছিলেন। ফলে এক দশকেই রাষ্ট্রের আয় দ্বিগুণ হয়েছিল, ফ্রান্স ইউরোপের প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত প্রসার ঘটেছিল, শিক্ষা বিস্তার হয়েছিল দেশের সর্বত্র, আর সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ইংল্যান্ডেও এমনিধারা অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রবর্তিত হয়েছিল যদিও আভ্যন্তরীন

বাণিজ্য ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে ফরাসী দেশের নীতি সেখানে প্রয়োগ করা হয়নি।

তিন শতাব্দি আগে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির মৌল নীতিমালা কি ছিল? প্রথমতঃ ছিল শুল্কের উঁচু দেয়াল ও দেশজ পণ্য উৎপাদনকে রক্ষা করতে আমদানী নিষিদ্ধ করণ। এর কারণ ছিল আভ্যন্তরীন আয় ও শ্রমবিনিয়োগের ব্যবস্থাকে সংহত করা। কারণ দেশজ উৎপাদনের ভিত্তি ছাড়া প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য বিদেশের সস্তা সুলভ সুন্দর পণ্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রে সরাসরি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ও সক্রিয় হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থে। উল্লেখ্য রাশিয়া, প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে অষ্টাদশ শতাব্দিতে অনেক শিঘ্রিই রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। তৃতীয়তঃ এ সমস্ত নীতি পদ্ধতির মূল চালিকা মন্ত্র ছিল রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে টিকে থাকা, অবদমিত বা পরাভূত না হওয়া। অবশ্য একথা স্মরণীয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উঠতি বণিক বুর্জোয়া শ্রেণীর পছন্দের ছিল না, তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন। আরও স্মরণীয় যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তত্ত্বের কাল ছিল রাজন্যবর্গের শাসনকাল; তখন যে উদারপন্থী রাজনৈতিক দর্শন সাধারণভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল, তারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর অবস্থানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাহলেও যে প্রশ্ন নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এ উপমহাদেশে ইউরোপের সমসময়ে যে রাষ্ট্রশক্তির উত্থান হয়েছিল যার ফলে সময়কালে যে জাতিসত্ত্বার উদ্ভব সম্ভব হতে পারত (হয়তাবা বহুধা বিভক্ত উপমহাদেশে) সেপথ ঔপনিবেশিক শাসন রুদ্ধ করে শিল্পায়ান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ বিনষ্ট করে দেয়। আমরা নতুন করে রাষ্ট্রশক্তির সন্ধান করছি, জাতিসত্ত্বাকে সংহত করতে চাইছি। এ প্রেক্ষিতে সে সময়ের ইতিহাস আমাদের জন্য জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির সপক্ষে কি কোন শিক্ষাই রাখে না?

তিন

সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির থাকে না বলে সীমিত আমদানী ও পর্যাপ্ত রফতানীর মাধ্যমে সৃষ্ট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত একদল বণিক শ্রেণীর উদ্ভবকে সম্ভব করেছিল যারা উন্মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য অভিধাকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। লক্ষ্যণীয় যে এ সময় ইউরোপে রাষ্ট্রশক্তি সংহত হয়েছে, জাতিসত্ত্বাও চিহ্নিত হয়েছে এবং জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যারা মুক্ত উদ্যোগ ও সীমিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাদের মধ্যে সম্রাট চুতর্দশ লুই এর শক্তিধর প্রণয়িনী মাদাম দ্য পম্পদরের চিকিৎসক ফাঁসোয়া কে'নে (১৬৯৪-১৭৭৪) উল্লেখের দাবিদার। তারা উদ্বৃত্ত বাণিজ্য তত্ত্বের বিপক্ষে যে যুক্তি তুলে ধরেন তাহল প্রথমতঃ অর্থনৈতিকভাবে যে কোন কাজ করার অধিকার একটি মৌল অধিকার এবং এর নিয়ন্ত্রণ National order and National law- এর পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ কৃষিই হল জাতীয় মৌল সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি, শিল্প ও বাণিজ্য নয়, কেননা সমস্ত সম্পদের উৎস হল প্রাকৃতিক সম্পদ। তৃতীয়তঃ বাণিজ্য উদ্বৃত্তের ব্যবস্থাকে সহজীকরণের পন্থার উপাদান মাত্র। অর্থাৎ এগুলো আরেকটি পণ্য মাত্র। প্রকৃত সম্পদ হল প্রাকৃতিক সম্পদে শ্রমের বিনিয়োগে সৃষ্ট পণ্যাদি। উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ক্ষতিকর এজন্য যে একটি দেশ অধিক প্রকৃত সম্পদ বিদেশে পাঠিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে অল্প প্রকৃত সম্পদ আনছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সম্পদশালী হতে হলে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এবং শ্রমের উৎপাদন শক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এটা মূলতঃ বর্তমানের কৃষি বনাম শিল্প বিতর্কের একটি প্রাথমিক সংস্করণ। কৃষিতে যথার্থ উন্নয়ন ছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্পসৃষ্টিতে সাহায্য রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করে না, জাতিসত্ত্বার বিকাশের জন্য বস্তুগত ভিত্তিও তৈরী করে না।

ফিজিওক্রাটদের এই তত্ত্ব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সীমিত করতে উৎসাহী ছিল। লক্ষ্যণীয় জাতি রাষ্ট্র ও সংহত জাতিসত্ত্বার উন্মেষের আগে এ তত্ত্বের জন্ম হয় নি বা তা প্রয়োগের প্রশ্নও উঠেনি। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ উঠতি বুর্জোয়াদের জন্য ছিল অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আর বুর্জোয়াদের উদারপন্থী মতবাদ তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্তির জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে স্বৈরাচার আর নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাকে সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী স্বাধীনতা বলে দার্শনিক তত্ত্বও দাঁড় করিয়েছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের নব্যধনীদের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক বণিকদের সাথে, সেখানে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণীয় নয়। কিন্তু শক্তিধর রাষ্ট্র, সংহত জাতিসত্ত্বা সৃষ্টিতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের যে শতাব্দিব্যাপী ভূমিকা, সেটি ছাড়া নিয়ন্ত্রণ মুক্তির দর্শন সংহত জাতিসত্ত্বা সৃষ্টির বিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারে। পার্থক্য হল, বর্তমানের নব্য বুর্জোয়া কিন্তু কৃষিতে উৎসাহী নয়, তারা শিল্প বাণিজ্যেই উৎসাহী। তাই তারা কৃষির পক্ষে কথা বলে না কিন্তু নিয়ন্ত্রণমুক্ত শিল্প বাণিজ্য গড়তে চায় বিদেশের বাজারের আশায়। এর মধ্যে সৃজনশীল জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে সেটি বিচারের দাবীদার। কারণ এ স্ববিরোধিতার কারণে ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতাব্দিতে যে দুই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, উন্নত বিশ্ব বা উন্নয়নশীল বিশ্বে আজও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি; পার্থক্য হল এটুকুই যে উন্নত বিশ্বে রাষ্ট্রশক্তি ও জাতিসত্ত্বা সংহত অবস্থানে আছে; দরিদ্র নিম্ন আয়ের দেশে সে অবস্থা বিরাজমান নয়। প্রশ্ন হল, তাহলে কেন ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়বার এমন প্রবণতা যা নব্যশিল্পায়িত দেশেও প্রাথমিক স্তরে কখনই দৃশ্যমান হয়নি।

চার

ফ্রান্সের ফিজিওক্রাটদের শক্তিধর মিত্রশক্তি হিসাবে স্কটল্যান্ডে দার্শনিক এ্যাডাম স্মিথের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি Theory of Moral Sentiments লিখে বিদ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে বৃটেনের এক ডিউকের সাথে তার সখ্যতা জন্মে। তাঁর সাথে তিনি বহুবার ফরাসীদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন আর এ সাথে পরিচিত হয়েছেন ফিজিওক্রাটদের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের সাথে। তিনি ফ্রান্সে বসেই তার বিখ্যাত An Enquiry into the Nature and Casuses of the Wealth of Nations লিখতে শুরু করেন আর এ বিশাল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে যে সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা শক্তিধর ইউরোপকে চমকে দিয়েছিল। সরকারীভাবে মুক্ত বাণিজ্য ও সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তার নিজের দেশে চালু হতে আরও সত্তর বছর সময় যেতে হয়েছে এবং সে নীতি আবার বিসর্জিত হয়েছিল ১৯৩০-এ। আবার এই আশীর দশকে তার সীমিত শক্তিতে বিতর্কিত আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিটি উন্নত দেশের অর্থনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হল তারা প্রকৃত মুক্ত বাণিজ্য ও সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হলেও উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা কখনই বিস্মরিত হয়নি এবং তাদের রাষ্ট্রশক্তি ও জাতিসত্ত্বার প্রয়োজনে ইতিহাসের বিস্তৃত সময়ে মার্কেনটাইলিষ্টদের অর্থনৈতিক নীতিমালাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আমরা তার অন্যথা করব কেন?

এমতাবস্থায় স্মিথের অর্থনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনার যথার্থতা আছে কি? নিশ্চয়ই আছে, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পশ্চিমের রাষ্ট্রপুঞ্জ IMF-WB-এর সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা যে দর্শনকে উন্নয়নের ভিত্তি করতে চাচ্ছে তার মূল ও প্রথম প্রবক্তা এ্যাডাম স্মিথ। তবে স্মরণীয় যে IMF-WB-এর দর্শন সত্ত্বেও এশীয় শিল্পশক্তিগুলো আজও সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমদানীর

উপর শুল্কের চড়া হার, রপ্তানী, উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় সাহায্য বজায় রেখেছে। পরাশক্তির ভূমিকায় যে অর্থনৈতিক 'Cost' আছে তারই কারণে যখন আমেরিকা বিপর্যস্ত তখন তার কম্যুনিজম বিরোধী রাষ্ট্রশক্তিগুলোর সাথে এশিয়া ও ইউরোপে স্মিথীয় দর্শন ভিত্তিক কলহ প্রকট হয়ে উঠছে। সেকারণেই আজ মুক্ত বাজার, নিয়ন্ত্রণ মুক্ত শিল্প ও ব্যবসা, শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য আমদানী উদারিকরণ ঃ বিরাষ্ট্রীয়করণ, ইত্যকার দুর্বল পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রচেষ্টা তীব্র হয়ে উঠেছে। সেকারণে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি বুঝতে আন্তর্জাতিকবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন স্মিথীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঔপনিবেশিক শাসকেরা উপনিবেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অনুন্নত অবস্থার সৃষ্টি করে রেখে গেছে অসম বিনিময়ের মাধ্যম। এটি একটি ঐতিহাসিক পরিহাস। এ পরিহাসের অন্য একটি উদাহরণ হল যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং। মার্কেন্টাইল জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগেই যুক্তরাষ্ট্র দেড়শ বছরে অত্যন্ত শক্তিধর রাষ্ট্রসত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়, আর সে তত্ত্ব থেকে সরে আসে যখন ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। কিন্তু চল্লিশ বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যে বিশাল ঘাটতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন। যুক্তরাষ্ট্র তখন তার অবস্থানকে শর্তাধীন করে মুক্ত ব্যবস্থা থকে সরে এসেছে যদিও মুক্ত বাজার ব্যবস্থার জন্য সে নিজেও IMF-WB এর মাধ্যমে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সমূহের নবতর উত্থান ঘটেছে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির মাধ্যমেই; মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ না করে।

স্মিথ ফিজিওক্র্যাটদের মতই শিল্পের অর্থনৈতিক মূল্যকে ছোট করে দেখেছেন এবং কৃষিকে প্রকৃত সম্পদের উৎস বলে মনে করতেন। স্মিথ আমেরিকায় কৃষির প্রাধান্যকে প্রংশসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে শিল্পায়ন আমেরিকার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। অবশ্য এ চিন্তার পেছনে ছিল ইউরোপীয় শিল্পের উৎকর্ষ ও দক্ষতা এবং মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা। কিন্তু স্মরণীয় যে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের মূল কারণই হল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনে আমেরিকার শিল্পায়ন বিরোধী মনোভাব এবং আমেরিকাকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করার প্রচেষ্টা। চার্চিল তার সুলিখিত ইতিহাস সম্পর্কিত বইতে স্বীকার করেছেন বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের যে ধারণা তা ছিল উপনিবেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিকভাবে শোষণ ও তাদের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে ছিল অগ্রসরমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নপন্থা নির্দ্ধারণে জাতীয় অধিকারের প্রশ্ন। আজ সে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোই উন্নয়নশীল বিশ্বের অগ্রগমণে প্রছন্নভাবে অথবা প্রত্যক্ষভাবে একই ধরনের বাধা সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির যথার্থ বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাদের দেশে পণ্যবিক্রির পথে বাধা আর সাহায্যের মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ এ দুই স্ববিরোধী তত্ত্ব নানাভাবে উন্নয়নশীল দেশে জ্যতীয় অর্থনীতির বিকাশকে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশ তার কোন ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্যণীয় যে স্মিথের তত্ত্ব যদি আমেরিকা মেনে নিত তাহলে কৃষিতে ঈর্ষণীয় উন্নতি হলেও শিল্পায়ন বিঘ্নিত হত কিন্তু স্মিথ যেটা লক্ষ্য করেন নি তা হল ঔপনিবেশিক শাসনের নীতিমালা আমেরিকার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল যার ফলে জাতীয়তাবাদের মনোভাব দৃঢ় হয়ে উঠছিল। অন্যভাবে বললে বলতে হয় স্মিথ তার মুক্ত বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদের তোষণ করেছেন কারণ তার আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও তত্ত্ব ও অসম মুক্তবাণিজ্য ছিল ইউরোপীয় শিল্পস্বার্থের পক্ষে উপনিবেশগুলো শোষণের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা। আমেরিকার বিদ্রোহ তাই কেবল বৃটেনের বিরুদ্ধে নয়, এটি ছিল স্মিথীয় অর্থনৈতিক দর্শনকে

জাতীয়তাবাদের কষ্টিপাথরে বিচার করে তার বর্জন। সেদিন আমেরিকা যে ভুল করেনি, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে, অথচ সে যুক্তরাষ্ট্র আজ উন্নয়নশীল দেশে স্মিথীয় অর্থনৈতিক দর্শনের বোঝা চাপিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমেরিকা সেদিন Domestic Resource Cost সম্পর্কিত তত্ত্ব যা তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব ও শ্রমের বিশেষায়ণের ভিত্তি তাকে পরিত্যাগ করেছিল কেননা আমেরিকা জানত তার পণ্যের জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দুয়ার উন্মুক্ত নয়, তার যে বিনিময় ক্ষমতা তা থেকে সর্বাধিক সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে স্মিথের সর্বাধিক পরিচিত তত্ত্ব হল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ উৎপাদক শক্তির সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে কারণ এমনি অবস্থায় সর্বজন তার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর অবস্থান নিশ্চিত করতে কোন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না। এই মুক্তবাজারের অদৃশ্য শক্তির পেছনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, এবং শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারণা বাস্তব জগতে আদর্শ মাত্র যার সন্ধান কোন দেশে কোন সময়ে কোন বাজারে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। স্মিথীয় দর্শনের একটি উৎসাহী সংযোজন হল জাঁ ব্যাপ্তিষ্ট সে'র তত্ত্ব যার মূল কথা হল সরবরাহ তার চাহিদা সৃষ্টি করে কারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য ও উৎপাদকের মূল্য চাহিদা ও সরবরাহ নির্ভর আর যে কোন বস্তুর উৎপাদন উৎপাদকের চাহিদা ও তার আয় নিশ্চিত করে কোন না কোন পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন নিশ্চিত করে। এ তত্ত্বের অন্তঃসার শূন্যতা কেইন্স পরবর্তীতে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। স্মিথীয় দর্শন যে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের অর্থনৈতিক নীতিমালায় গ্রহণ করেন নি শুধু তাই নয় উন্নয়নশীল যুক্তরাষ্ট্র সদ্যস্বাধীন হয়ে এ তত্ত্বের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েই নিজের অর্থনীতিকে শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতির পত্তন করেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৯১)।

আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির মূল স্থপতি ছিলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন যিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটনের মিলিটারী সহকারী হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তাকেই প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন তার অর্থমন্ত্রী Secretary of Treasury হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আমেরিকার ইউনিয়নের কংগ্রেস হ্যামিলটনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেন। তখন আমেরিকান ইউনিয়নে ভূস্বামী আর বণিকের প্রাধান্য চলছে। আর স্মিথীয় দর্শন ও ফরাসী দেশের ফিজিওক্রাটীক দর্শন কৃষির প্রাধান্য ও কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকে উন্নয়নের সহজ উপায় বলে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হ্যামিলটন আটলান্টিকের পরপারে ক্ষুদ্র একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অমিতবিক্রম সামরিক শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন ফরাসী দেশের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা ছাড়া স্বাধীনতার যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন যে বৃটেন কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমেই তার অর্থনৈতিক শক্তি খুঁজে পেয়েছিল আর তাই পরাক্রমশালী সামরিক শক্তিকে সমর্থন যুগিয়েছিল। সুতরাং হ্যামিলটন কংগ্রেসে যে রিপোর্ট দাখিল করলেন তাতে তিনি জোরালোভাবে স্মিথীয় দর্শনকে বাতিল করে শক্তিশালী জাতি-রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে দ্রুত শিল্পায়নের সুপারিশ করলেন; শিল্পপণ্য আমদানী বন্ধ করেই সেপথে অগ্রসর হবার যুক্তি দিলেন, না হলে উন্নত ইউরোপের শিল্পপণ্যে আমেরিকা ভেসে যাবে। হ্যামলটন যুক্তি দেখালেন ভবিষ্যৎ রয়েছে শিল্পয়ানে ও শিল্পপণ্যের বাণিজ্যে আর বাণিজ্য তখনই শুল্কমুক্ত হবে যখন আমেরিকা প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হয়ে উঠবে। হ্যামিলটন তাই সজ্ঞানভাবে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়তে মুক্ত বাজারকে বর্জন করলেন,

বাণিজ্যকে সীমিত করলেন আর শিল্পায়নকে সম্ভব করতে কৃষিকে শিল্প ও প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করলে। তিনি কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নকে সহগামী প্রক্রিয়া হিসাবে তুলে ধরেন। যারা আমদানী উদারীকরণে উন্নয়ন তত্ত্বের উৎকর্ষ দেখছেন তাদেরকে হ্যামিলটনের লেখা পড়ে দেখতে বলব এবং তার যুক্তি দু'শবছর পরেও উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ মুক্তবাজার নীতিতে বৃটিশ শাসনে ডান্ডি ও কলকাতার জন্ম দিয়েছে, পাকিস্তান আমলে সমৃদ্ধ করাচীর সৃষ্টি করেছে কিন্তু তার শিল্পায়ন ও কৃষিজ অগ্রগতি সম্ভব হয়ে উঠেনি। আমেরিকা ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির স্বপক্ষে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, পরনির্ভর বাংলাদেশ সে সজ্ঞানতা থেকে বঞ্চিত। হ্যামিলটন চেয়েছিলেন দ্রুততার সাথে ইউরোপীয় শিল্পসমৃদ্ধ দেশের সমকক্ষ হতে একটি গর্বিত জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে যার জন্য নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, শিল্পায়নে সরকারী সক্রিয় ভূমিকা ও ভর্তুকী আর কৃষি ও শিল্পের সম্পুরক অগ্রগতি এবং সেজন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণার সমৃদ্ধি তার উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমালিকানা খাত সম্প্রীতির মাধ্যমে সহযোগী হয়ে উঠবে যাতে জাতীয় সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। মুক্ত বাজারের অদৃশ্যহাতের খেলায় জাতীয়তাবাদী হ্যামিলটনের বিশ্বাস ছিল না তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রবক্তা ছিলেন। তার জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি আমেরিকার জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নের সাথে সম্পৃক্ত তাই স্মিথীয় দর্শন বা মারকেনটাইল নীতি কোনটিই তিনি গ্রহণ না করে জাতি স্বার্থ ও রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। হ্যামিলটনের অর্থনৈতিক দর্শন তাই অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দশক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে আমেরিকার অর্থনীতিকে পরিচালনা করেছে সক্রিয়ভাবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোন শক্তিধর অর্থনৈতিক দর্শনের জন্ম দেয়নি, যার ফলে আমাদের জাতিসত্ত্বা আজ সংশয়িত। রাষ্ট্রশক্তি আজ দুর্বল, সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন।

পাঁচ

আমেরিকাতেই কেবল নয় জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল উনবিংশ শতকে। উনবিংশ শতকের মধ্য পর্যন্ত জার্মানী ছিল একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং শক্তির দাবাখেলায় তার কোন স্থান ছিল না। ফ্রান্স ও বৃটেন সে গৌরবের অধিকারী ছিল। কিন্তু ঐ শতাব্দির শেষ পাদে জার্মানী এমনি শক্তিধর জাতি হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল যে ফ্রান্স ও বৃটেন জার্মানীকে সমীহ করতে শুরু করল। এ পরিবর্তনের নায়ক ছিলেন ফ্রেডরিস্ লিষ্ট ও অটো কন বিসমার্ক। প্রথমজন ছিলেন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ এবং বিসমার্ক ছিলেন দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু বিসমার্ক জীবন শুরু করেছিলেন মুক্ত বাজার মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক হিসাবে। কিন্তু সে উদারনৈতিক মতবাদ জাতীয়স্বার্থে ভ্রান্ত বলে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি জার্মানীকে শক্তিধর করে তুলতে উচ্চ শুল্ক ধার্য করে দেশে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব কোনদিনই জার্মানীকে শক্তিধর আধুনিক শিল্পায়িত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে দেবে না। ভূস্বামীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য আমদানী শুল্কে সহমত দিয়েছিলেন এই শর্তে যে কৃষি পণ্যেও অনুরূপ শুল্ক বসানো হবে। এ অর্থে বিসমার্ক হ্যামিলটনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। হ্যামিলটনের শুল্ক ব্যবস্থা কেবল শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিসমার্কের কৃষি খাতকে রক্ষার জন্য শুল্কের যে ধারা তা আজও ইউরোপের সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে বর্তমান আর এ নিয়েই বর্তমানে আমেরিকার

সাথে দ্বন্দ্ব। বর্তমানে কেবল শুল্ক ও আমদানীর পরিমাণের পরিমিতি নয়, কৃষিখাতে ভর্তুকীও কম নয়। কৃষিখাতকে এমনিভাবে চাঙ্গা রাখার নীতি কেবল ইউরোপে নয় জার্মান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানেও দেখা যায়।

বিসমার্কের এই পরিবর্তনের পেছনে ছিল ফ্রিডরিস্ লিষ্ট-এর লিখিত বই The National System of Political Economy। এ বইতে লিষ্ট স্মিথের Wealth of Nations এর তত্ত্বকে বাতিল করে দেন। লিষ্ট বলেন স্মিথের তত্ত্বের পেছনে রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদে অসীম বিশ্বাস যার মাধ্যমে সর্বদেশের মানুষ সর্বমানবের কল্যাণে কাজ করে যাবে। এ বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকলে বিশ্বের জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র বিশাল ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি মাত্র, তখন ব্যক্তিস্বার্থ মানবকল্যাণের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায় না আর রাষ্ট্রীয় কোন নিয়ন্ত্রণ এ ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে, কিন্তু বাস্তব তা নয়। ব্যক্তি ও বিশ্বের মাঝে রয়েছে জাতি-রাষ্ট্র এবং জাতিরাষ্ট্র উন্নত ও শক্তিধর না হলে সে রাষ্ট্রকে অন্যরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। লিষ্ট বিশ্বাস করতেন শিল্প কৃষির চেয়ে উন্নত অর্থনৈতিক কর্ম এবং সেকারণেই শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। টিকে থাকার জন্য শুল্ক আরোপ করতে হবে। শিল্প কৃষির চেয়ে উন্নত কর্ম এজন্য যে শিল্পায়নে অধিকতর শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যার ফলে সমাজে ধ্বনাত্মক পরবর্তন আসে। এছাড়াও শিল্পায়ন জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তুলনা করে দেখালেন যে শিল্পায়ন ও শিল্পায়িত জাতির মানসিক শক্তি অনেক বেশী, স্বাধীনতার স্পৃহা অদমিত আর কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর জাতির মানসিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নস্তরে অবস্থান করে কারণ তারা ভাগ্যবাদী হয় ও উদ্যোগ ও উদ্যমে তাদের মানসিক আর্তি থাকে কম। যেহেতু শিল্প অধিকতর মূল্য সংযোজন করতে সমর্থ হয় সেহেতু শিল্পায়নের ফলে দেশজ উৎপাদন সহায়ক উপকরণের ব্যবহার হয় ভাল, শিল্পে শক্তির (Energy) ব্যবহার অধিকতর বলে শক্তির সন্ধান ও বিনিয়োগ উৎকর্ষ সাধন করে। শিল্প-কৃষির মিশ্রক্রিয় কৃষিকেও উন্নত হতে সাহায্য করে অগ্র ও পশ্চাদবর্তী সম্পর্কের মাধ্যমে। কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়ে, কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কৃষিতে মুনাফা, খাজনা ও মুজুরিও বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন প্রকার কৃষি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে কৃষিপণ্যের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়।

লিষ্টের কাছে শিল্প হল সমাজ পরিবর্তনের একটি অত্যাবশ্যকীয় শক্তি, এর মাধ্যমে (Capital) সৃষ্টি হয়, এটি স্মিথের মতানুযায়ী শ্রম ও সঞ্চয়ের বিকল্প ব্যবহার মাত্র নয়। সেজন্য স্বল্পকালীন ক্ষতি স্বীকার করেও শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। লিষ্টের মতবাদ উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরে একটি অতি কার্যকর ব্যবস্থা। লিষ্ট ছিলেন অর্থনীতির ইতিহাস-নির্ভর স্কুলের একজন প্রবক্তা যারা ইতিহাসের শিক্ষাকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণে প্রয়োজনীয় মনে করতেন, স্মিথের মত কোনমাত্র বিমূর্তধারণায় তাদের বিশ্বাস ছিল না। লিষ্ট, এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, আমেরিকা সফর করেছিলেন এবং হ্যামিলটনের জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিসমার্ক লিষ্টের মতবাদকেই ব্যবহার করেছিলেন। এই শুল্ক নির্ভর শিল্পায়ন নীতির ফলেই এক প্রজন্মের ভিতরেই দুর্বল বিচ্ছিন্নতাবাদী জার্মানী ইউরোপে এক প্রধান শিল্পশক্তি হিসাবে নিজের জায়গা করে নেয়।

ছয়

যখন জার্মানী ও আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী পরিবর্তন আসছিল তখন আরেকটি দেশ এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সেদেশটি হল সূর্যোদায়ের দেশ নিপ্পন বা জাপান। দুর্বল, অনুন্নত কৃষি, সামন্ততান্ত্রিক দেশ

জাপান কি করে বিশ্বশক্তি হিসেবে স্বপ্রকাশ ঘটালো এ কাহিনী আরও বিস্ময়কর ও নাটকীয়। জাপানের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সচেতনভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান অনুসরণ করেছে।

আজও জাপানী অর্থনীতি মার্কেনটাইল দর্শন অনুসরণ করছে, যা দিয়ে তার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শুরু। সেজন্য আমেরিকা ও ইউরোপ এমনভাবে জাপানের উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়ে উঠে। লক্ষ্যণীয় যে বিশ্বের অন্যতম শিল্পশক্তি হয়েও জাপান তার মর্কেনটাইল দর্শনকে বর্জন করেনি। এটিই জাপানকে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশেষভাবে পৃথক করে চিহ্নিত করে।

১৮৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে নৌশক্তির ভয় দেখিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ প্রথম খুলে দেয়। তখন জাপান ছিল অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশ। শুধু তাই নয় যুক্তরাষ্ট্র আমদানী শুল্কের সীমা শতকরা পাঁচ ভাগে সীমিত রাখতে জাপানকে বাধ্য করে, যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজে অতি উচ্চ হারে (৫০০%) আমদানী শুল্ক ধার্য করেছিল। এর ফলে জাপানের বাজারে বিদেশী পণ্য এমনভাবে আসে যে জাপানের নিজস্ব কাপড়, কাগজ ও চিনির মত ক্ষুদ্র শিল্প বিনষ্ট হয়ে যায়। জাপানের এই উন্মুক্তদ্বার অবাধ বাণিজ্যের ফল ভাল হয়নি। তার মুদ্রাব্যবস্থা বিনষ্ট হয়, তার কৃষি ব্যবস্থাতেও এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সেকারণে জাপান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশজ শিল্পকে বাঁচাবার জন্য আমদানীর ক্ষেত্রে উচ্চ শুল্ক হার প্রবর্তন করে আর বিদেশী বিনিয়োগ যাতে না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যবস্থার আজও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। যে কারণে কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী এ বলে অভিযোগ করেন যে জাপানের সার্বিক ব্যবহার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল সদ্য উন্নয়নকামী দেশের মত। জাপান সাম্প্রতিক কালেও বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রথার মাধ্যমে তার আমদানী অতি শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উচ্চশুল্ক ছাড়াও ঐচ্ছিক কোটা আমদানীর সীমা নির্দিষ্টকরণ, আমদানীর পণ্য ও উৎপাদনস্থলের ব্যাপারেও সক্রিয় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এ সমস্তই সেদেশের আমদানী সীমিতকরণের পদ্ধতি হিসেবে আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সীমিত করণের নীতি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও জাপান সমান আনুগত্যের সাথে প্রয়োগ করেছে। যে কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জাপানে বৈদেশিক বিনিয়োগ তেমন হয়নি। জাপান কেবল যে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে পারবে সেসব ক্ষেত্রকেই সীমিত করেনি তারা বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাপানী ব্যবস্থাপনার জন্যও শর্ত রেখেছে; বৈদেশিক কোন নাগরিকের উচ্চপদে নিয়োগের ব্যাপারেও কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ চালু রয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ জাপানী মালিকানার শর্তও রাখা হয়েছে। বিদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জাপান একটি জাতীয় সতর্কতামূলক ঐক্যমত রয়েছে যার মূলে রয়েছে কমোডর পেরীর সেদেশের জন্য অপমানজনক অভিযান। জাপানে বিদেশী আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সবসময় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা সংরক্ষণ করেছে। যে কারণে সাবুরো ওকিতা অত্যন্ত গর্বের সাথে বলেছেন যে জাপান কোন বৈদেশিক মূলধন ছাড়াই উন্নত হয়েছে এবং জাপানী অর্থনীতিতে সে বিদেশী নিয়ন্ত্রণকে পরিহার করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের নীতি নির্ধারক ও উচ্চবিত্তের মনোভাব এর বিপরীতে অবস্থান করে যদিও দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণ ও বর্তমানের বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশকে অপমানকর অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে।

সাত

উনিশ শত দশ সালের মেক্সিকান বিপ্লব বিশ শতকের প্রথম বিপ্লব, রুশ বিপ্লবেরও আগে। মার্কসীয় দর্শনের অনুসারীদের দ্বারা সাধিত রুশ বিপ্লবের বিপরীতে মেক্সিকোর বিপ্লব ছিল জাতীয়তাবাদী এবং

মেক্সিকোর নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাই এ বিপ্লবের মূল প্রেরণা ও ধারণা যুগিয়েছিল, এতে কোন ধার করা তত্ত্ব স্থান পায় নি। বিপ্লব ছিল ক্ষুদ্র প্রভাবশালী ভূস্বামী, যাজকশ্রেণী, সামরিক বাহিনী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যারা ৩০ বছর ধরে এক নায়কত্ব ও স্বৈরাচারকে দেশের উপরে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা একটি অলিগার্কিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। দেশজ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে জয়ী হয়। প্রোফিরিও ভিয়াজের সরকার বিদেশী পুঁজি ও শক্তিধর দেশজ শ্রেণীর সাথে আঁতাত করে জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছিল। বিদেশী পুঁজি দেশজ উদ্বৃত্ত বিদেশেই পাচার করত এবং এদের কোন ক্রিয়াকর্ম দেশের আপামর জনসাধারণের উন্নতি করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ক্ষেত্রে আমদানী নীতি সংরক্ষণবাদী হিসেবেই দেশজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। জাপানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদী নীতি ছাড়াও রাষ্ট্র নেমেছিল Entrepreneur এর ভূমিকায়। মেক্সিকোর ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মালিকানাও নিয়ন্ত্রণ ছিল রাষ্ট্রের হাতে এবং রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হল সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগেরও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল। ফলে শিল্পে ও বাণিজ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সহাবস্থানের আহবানের সৃষ্টি হয় যা থেকে মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্ব জন্ম নেয়। শক্তিধর রাষ্ট্রের কামনা ও বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্য এমনি এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। ডানিয়েল ক-সিও ভিলেগার্স এই বিপ্লবের মূলনীতি হিসেবে বলেন যে রাষ্ট্রের হাতে দেশের ও সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পন করা হয় এর ফলে বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ (যা ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতকে বিদ্যমান ছিল) অর্থনৈতিক প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ক্লাসিক্যাল স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে মেক্সিকান জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিমালার ফলেই, কানাডীয় অর্থনীতিবিদ বেনজামিন হিসিন্স বলেন, একটি অনুন্নত কৃষিনির্ভর দরিদ্র মেক্সিকো চার দশকে শিল্পায়িত দেশে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। এরজন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং যেখানে দেশজ বেসরকারী খাতও বিকশিত হতে পেরেছে। মেক্সিকো তাই দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের সমকক্ষ অর্থনৈতিক শক্তির কারণ উন্নয়নের হার ছিল গড় বৎসরে ৮ শতাংশের বেশী এবং অর্থনৈতিক খাতে মৌলিক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছিল এ সময়ে। স্মরণ রাখা উচিত মেক্সিকোই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের স্বার্থে বিদেশী বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অধিগ্রহণের নজীর স্থাপন করে।

আট

তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরীয়া এশিয়া-প্রশান্ত সাগর অঞ্চলে দুই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যারা তাদের সাধিত উন্নয়ন দিয়ে বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। জাপানের মত তাদেরও বিশেষ কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই এবং জাপানের মত তারাও মার্কেনটাইল অর্থনীতিই অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে-যতপার শিল্পায়িত দ্রব্য রপ্তানী কর আর আমদানীকে তেমনিভাবে সীমিত কর।

তাইওয়ানের অর্থনীতি সম্পর্কে আমেরিকার এক ব্যাঙ্কার সম্প্রতি International Herald Tribune-এ লিখেছেন, যে সরকার সরাসরি একচেটিয়াভাবে ব্যাঙ্ক, জাহাজ নির্মাণ, ইস্পাত, সার ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের সাথে তারা মূল্য নির্দ্ধারণী কার্টেল হিসেবে যুক্ত।

বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। আমদানী অত্যন্ত সীমিত, আমদানী শুল্কের হার প্রায় ৬০ শতাংশ যা থেকে সরকারী আয়ের এক-পঞ্চমাংশ আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাইওয়ানের বিস্ময়কর উন্নয়নকে কি অস্বীকার করা যায়? মাত্র বিশ বছরে একটি অনুন্নত কৃষি নির্ভর দ্বীপ থেকে একটি দ্রুত অগ্রসরমান শিল্পসমৃদ্ধ দেশে সে পরিণত হয়েছে।

তাইওয়ানের এ সাফল্য খ্রীষ্টের অদৃশ্য হাতের কারসাজী নয়। মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত বাজার ও নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারী উদ্যোগেরও ফসল নয়। ১৯৪৯ সালেই তাইওয়ান GATT থেকে সরে আসে এবং এদিকে সে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে সে তার দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত রাখছে না এবং সে যে শিল্পায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সেজন্য বাণিজ্যিক বাধানিষেধ অতীব প্রয়োজনীয়। তাইওয়ান জাপানের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুসরণে সরকারী খাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কর্পোরেশন স্থাপন করে। সাম্প্রতিককালে Asian Wall Streat Journal উল্লেখ করে তাইওয়ানের সরকারী আয়ের (NT $ 323b) ৭৯%শতাংশ আসে সরকারী শিল্প কর্পোরেশনগুলো থেকে। তবুও তাইওয়ানকে তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হয়নি। ১৯৭১ যখন তাইওয়ান সরকারী খাতে ভারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয় তখন লক্ষ্যছিল শিল্পক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন। সেবছর তাইওয়ান ঘোষণা করে যে বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি সেসব ক্ষেত্রে দেওয়া হবে না যে সব ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনের সাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ রয়েছে এবং বিদেশী পুঁজিকে তাইওয়ানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রভাব ফেলতে দেয়া হবে না। অন্যদিকে তাইওয়ান রপ্তানীমুখী ও উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারী ও দেশজ বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার নীতিও গ্রহণ করে। তাইওয়ান সপ্তদশ শতকের ইতালীয় অন্তনিও সেরার উপদেশের প্রতিধ্বনী করে সংরক্ষিতভাবে রপ্তানী-মুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনে তৎপর হয়। এসবই তাইওয়ানের সাফল্যের মূলনীতি।

দক্ষিণ কোরীয়ার শিল্পায়ন শুরু হয় ষাটের দশকে। এটি একটি উষরভূমির দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া জাপানও তাইওয়ানের মতই জাতীয়তাবাদী মার্কেনটাইল নীতিই অনুসরণ করেছে। শিল্পপণ্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার রপ্তানী সম্প্রসারণে তৎপরতা, আমদানী সীমিতকরণে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারী ও বেসরকারীখাতের নিকট সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ও এককভাবে নির্ধারক ভূমিকা রেখেছে। মালয়েশিয়া তার শিল্পায়নের স্বার্থে যখন দক্ষিণ কোরীয়া ও তাইওয়ানের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করেছে তখন ISIS এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছায় যে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে সরকারের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ। এখানে সরকারী-বেসরকারী খাতের সম্পর্কে সরকারই প্রধান ও নীতি নির্ধারণকারী শক্তি। Far Eastern Economic Reviewতে দক্ষিণ কোরিয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিচার করতে গিয়ে এ মন্তব্যই করা হয়েছে যে যারা দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নকে ধনতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতির সাফল্য বলে দেখতে চান তারা ভুলে যান কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সরকারী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারী মালিকানাধীন প্রধান প্রধান শিল্পগুলো, সরকার নিয়ন্ত্রিত বেসরকারী খাতের জন্য ঋণ ও উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থাই এ সাফল্যের কারণ। এটি দক্ষিণ কোরিয়ার বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কোন পৃথক সাফল্য নয়, এটি একটি দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য। বাস্তবে দক্ষিণ কোরিয়ার পরিকল্পনা সংস্থা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেরা, মান, করবের লিষ্ট ও হ্যামিলটনের

অর্থনৈতিক ধারণার বাস্তবায়ন করেছে, স্মিথের আদর্শের নয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় শিল্পায়নের গতি কৃষি খাতের উন্নয়নের চেয়ে দ্রুতই কেবল হয়নি, অনেক সময়ই এটি কৃষিখাতের উন্নয়নের বিনিময়ে হয়েছে। শিল্পখাতের মূল্যসংযোজনের বৃদ্ধি ঘটেছে গড়ে বছরে ২০-৩০ শতাংশ হারে যখন কৃষি খাতে এটি ছিল মাত্র চার শতাংশ। পার্ক চুংহির আমেরিকার অর্থনৈতিক উপদেষ্টারাই উন্নয়নের যে কৌশল ও নীতি তৈরী করেছিলেন এটি তারই ফল কারণ উষর ভূমিতে সম্পদ সৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা কখনই দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল না। কোরিয়া অত্যন্ত সজ্ঞানভাবে প্রধান খাতসমূহের মধ্যে ভারসাম্যহীন উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছিল। যখনই ১৯৬৮ সালে কোরিয়া একটি বৃহৎ অবিভাজিত ইস্পাত শিল্প সংস্থা স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়, বিশ্বব্যাংক ও তার সমস্ত সহযোগী সংস্থা তার বিরোধিতা করেছিল। তারা এটিকে ঝুকিপূর্ণ, অপ্রয়োজনীয়, অতিমাত্রায় খরচপ্রবণ বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু কোরিয় সরকারের জাতীয়তাবাদী অনুভূতি সরকারী খাতে Pohang Steel Mill স্থাপন করে যেটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়ে জাপান ও আমেরিকার ইস্পাত শিল্পের সাথেও সফলভাবে প্রতিযোগিতা করছে।

এখানে স্মরণযোগ্য জাপান ও তাইওয়ানের মতই দক্ষিণ কোরিয়া অত্যন্ত শক্তহাতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ সম্পর্কে তাদের পরিত্রাতা যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রুকুটি তারা উপেক্ষা করেছে। ১৯৬৮ সালে কোরিয় সরকার ভর্তুকী দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মেশিনারী শিল্পও গড়ে তোলে এবং মেশিনারীর আমদানী ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে ১৭৯১ সালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের রিপোর্ট স্মরণে আসে। এ মেশিনারী শিল্পগুলো সরকারীখাতে অথবা সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এই মৌল ভিত সৃষ্টিকারী উদ্যোগই দক্ষিণ কোরিয়ায় সফল শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তোলে। যে নীতির অনুসরণ আমাদের সাহায্যদাতাদের শর্তাবলী প্রায় সব সময়ই অসম্ভব করে তুলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগকেও উৎসাহ দেয় নি; বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থার দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকেও উৎসাহ দেয়নি। তাদের স্টক বাজারে বিদেশীরা দেশীয় শিল্পের কোন শেয়ার কিনতে পারে না। অথচ আমরা বিদেশী পুঁজির আশায় আমাদের নাজুক ষ্টক, অর্থসংস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য সবই বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করেছি নিঃশর্তভাবে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলো তাইওয়ান ও কোরিয়ায় অত্যন্ত সীমিত ক্রিয়াকর্ম করতে পারে। তারা রপ্তানীক্ষেত্রে ঋণ দিত না কারণ রি-ডিসকাউন্ট সুবিধা তাদের নেই। তারা স্বল্পসময়ের ডিবেঞ্চারও ইস্যু করতে পারে না। তাদের Loan portfolio সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মাত্র ৩ শতাংশ। বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে, বিদেশী ব্যাংকের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান অত্যন্ত সজ্ঞানভাবে বিদেশী অর্থব্যবস্থার প্রভাব এড়িয়ে গেছে। আরও বলা প্রয়োজন এদেশগুলোতে দেশের সার্বভৌমত্ব এড়িয়ে export processing zone নেই, এরা দেশীয় শিল্পকে ভর্তুকী দিয়ে, উন্নত মানব সম্পদ যুগিয়ে, নিজেদের প্রযুক্তিজ্ঞান বাড়িয়ে, গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি আত্মস্থ করে ক্রমশঃ দ্রুত নিজেদের প্রতিযোগিতার শক্তি সৃষ্টি করেছে।

ইন্দোনেশিয়া তাদের আধুনিক শিল্পায়নের শুরু করেছে আশীর দশকে। তারাও আমদানী ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত করেছে, শিল্পায়নকে দ্রুততা দিয়েছে। শুধু তাই নয় ইন্দোনেশিয়া সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শিল্পবাণিজ্যের মালিকানা অ-ইন্দোনেশিয়াদের ব্যাপারে সীমিত করে আনছে। সরকার বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়দের (চাইনিজ নয়) সম্পৃক্ত করেছে এবং প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে

ইন্দোনেশিয়দের হাতে ছেড়ে দেবার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। কোন বিদেশী শিল্প-বাণিজ্যসংস্থাই সংখ্যাগুরু শেয়ারের মালিক দশ বছরের বেশীকাল ধরে থাকতে পারে না। বিদেশীরা স্থানীয় ব্যাংক থেকেও অর্থ ঋণ নিতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ার এই জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি তাদের প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করেনি। এক কালের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অনুন্নত দেশ যেখান থেকে কাঁচামাল ও তেলের সরবরাহ হত, সে আজ মেশিনারী, ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্সের মত ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণে অনেকখানি সফল হয়েছে।

মালয়েশিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাপান হতে চায়। দ্রুত শিল্পায়নই তার কাম্য। এজন্য মালয়েশিয়া প্রধানত ঃ নির্ভর করেছে সরকারী সংস্থা HICOM (Heavy Industries Corporation of Malayasia) এর উপর। আশীর দশকে যাত্রা শুরু করে এ সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের ভারী শিল্প স্থাপন করেছে যার পণ্য তারা ইউরোপেও সফলতার সাথে রপ্তানী করছে। সত্তরের দশকে সরকারী খাতে তারা হোটেল, অফিস বিল্ডিং, ক্যাসু, আনারস, চা, রাবার ও পামের বাগান থেকে শুরু করে কাপড়, ইস্পাত, আসবাবপত্র, টিনজাত দ্রব্য, শিল্প ব্যবহৃত কেমিকেল, জুতা তৈরী করতে শুরু করে। তারা কৃষি পণ্যও শিল্প প্রযুক্তির ব্যাপারে গবেষণার বিস্তৃত অবকাঠামোও সৃষ্টি করে। মালয়েশিয়ায় আজ ১১৫টিরও বেশী সরকারী সংস্থা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থখাতে ক্রিয়াশীল। এদের অধীনে ৫০০টিরও বেশী সাবসিডিয়ারী কোম্পানী রয়েছে। তারা সর্বক্ষেত্রে ভূমিপুত্রের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে। সরকার বিদেশী পুঁজির মালিকানাও এসব ক্ষেত্রে সীমিত করেছেন। বিদেশী বিনিয়োগের শর্তসমূহ বেশ শক্ত এবং EPZ থেকে তাদের Employment বা Value added অভ্যন্তরীণখাতের তুলনায় তেমন কিছু নয়।

থাইল্যান্ডকে মনে করা হয় সম্ভাবনাময় নবতম এশিয়া শিল্পশক্তি। এর শিল্পখাত বছরে গড়ে ১০% করে বেড়েছে। এই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ৭০টি সরকারী উৎপাদন সংস্থা বছরে শতকরা ২০% হারে তাদের প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। Thailand Tobacco Monopoly এর তামাক আমদানীর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। তবুও ১৯৩২ সাল থেকে সরকার সজ্ঞানভাবে স্থানীয় উদ্যোগীশ্রেণী সৃষ্টিতে সচেষ্ট রয়েছে যাতে চাইনিজ প্রভুত্ব কমে আসে। থাইল্যান্ডে তিরিশের দশকে বিদেশী সংস্থার জাতীয়করণ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে বিদেশী সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল কড়া। পঞ্চাশের দশকে সরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নের শুরু। ষাটের দশকে বিশ্বব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারী সংস্থাগুলোর সমালোচনা করতে শুরু করে, কিন্তু থাই সরকার তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। থাই সরকার বিদেশী দ্রব্যের উপর ৩০০% থেকে ৬০০% শুল্ক বসিয়েছে আর দেশের ভিতরে বিদেশী পণ্যের নকল গড়ে উঠতে বাধা দেয়নি। ফলে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী কমেছে, দেশের ভিতরে বিদেশের সমতুল্য দ্রব্যের উৎপাদনের সম্ভাবনা বেড়েছে। থাইল্যান্ড একারণে WIPO থেকে সরে থেকেছে।

সিঙ্গাপুরকে মুক্তবাজার অর্থনীতির আদর্শ বলে চিত্রায়িত করা হয়। কিন্তু সত্য হল সিঙ্গাপুরে সরকার নাবিক হিসাবে, উদ্যোগী হিসাবে, ব্যাবস্থাপক হিসাবে, নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিশাল বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থিত রয়েছে। সিঙ্গাপুর উন্নয়নের স্থপতি Dr. Goh Ken Swee নিজেই বলেছেন এটি laisses Faire অর্থনীতি নয় কারণ মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের উন্নয়নে কোন অর্থবহ অবদানই রাখেনি; ঐ নীতির সময় দেশে ছিল বিশাল সংখ্যায় বেকার, অস্বাস্থ্যকর গৃহব্যবস্থা, অপ্রতুল শিক্ষার সুযোগ। সুতরাং রাষ্ট্রকে সক্রিয় হস্তক্ষেপের ভূমিকা নিতে হয়েছে। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, পরিবার

নিয়ন্ত্রণ করা, গৃহায়ন, গবেষণা থেকে শুরু করে শিল্প ও বাণিজ্যে সরকারের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও মুখ্য। বেসরকারী খাতের জন্য অত্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে, কি তারা করতে পারবে আর কি তারা করতে পারবে না। আমদানী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নেই কারণ তার রক্ষা করার জন্য তেমন কোন শিল্পখাত নেই। বিদেশী পুঁজি এখানে রপ্তানীর জন্য সুবিধাদি গ্রহণ করে। সুতরাং এখানে সুদক্ষ সেবাখাতই প্রধান; কিন্তু যেসমস্ত দেশীয় শিল্প রয়েছে, সরকার তাকে যথাযথ সুরক্ষা করেছে। তামাক, এলকোহল, আসবাব, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, চিনি, চকলেট, বিস্কিট এ সমস্তের উপর শুল্ক বেশ চড়া।

নয়

আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় সপ্তদশ শতাব্দি থেকে বিংশ শতাব্দির শেষ দশক পর্যন্ত এসেছি। আমরা উন্নত দেশের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি এবং বর্তমানে দ্রুত উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশের উন্নয়নের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছি। এ থেকে আমাদের কি সাধারণ উপাদান বেরিয়ে আসে? প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় নীতি ও তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র মালিক উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, নীতিনির্দ্ধারক, উৎপাদক হিসাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পায়নই প্রধানতঃ উন্নয়নের প্রধান কৌশল, যদিও কৃষির সহায়ক উন্নয়নও অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ দেশের আভ্যন্তরীন বাজার বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গুটিকয় প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রবেশই কাম্য। চতুর্থতঃ সিঙ্গাপুর ছাড়া সমস্ত দেশই বিদেশী পুঁজির প্রবেশ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। পঞ্চমতঃ প্রযুক্তি, মানব সম্পদের সহায়ক ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ষষ্ঠতঃ রপ্তানী শিল্পকে দ্রুত ও দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হয়। সপ্তমতঃ বিদেশী অর্থসংস্থার উপর নির্ভরতা পরিহার প্রয়োজন। অষ্টমতঃ জবাবদিহিকারী জনদরদী, দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠির প্রশাসনে প্রাধান্য অপরিহার্য। নবমতঃ সৃজনশীল জাতীয়তাবাদই উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। বাংলাদেশের বর্তমান পরনির্ভরশীল উন্নয়ন চিন্তায় এসমস্তই অনুপস্থিত। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির বিকাশে প্রথমেই বুঝতে হবে উন্নয়ন হল জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হবার জন্য আপন পরিমন্ডলে জনগণকে তাদের অভিজ্ঞানসহ সমৃদ্ধ হবার প্রক্রিয়া; এটি কোন আমদানী করা মডেল বা জ্ঞান থেকে আসে না; যদিও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার শিক্ষার নামে উন্নত দেশ থেকে আমরা সুবিধাভোগীরা একে আহরণ করে আনি এবং একে এদেশের বাস্তবতার নিরিখে যাচাই না করে সে পণ্যের পসরা বিদেশী সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে আমলাতন্ত্রের (কখনও সামরিকতন্ত্রের) অধীনে জনগণের উপর চাপিয়ে দিই। যে দেশগুলোর কথা উপরে বলেছি তারা কেউ তা করেনি। বিদেশের তত্ত্ব থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে, এবং যারা একে দেশজ ভিত্তিতে নিজের করে নিয়েছে তারাই উন্নত হয়েছে এবং যারা বিশ্বাস করেছে উন্নয়ন কৌশলের জ্ঞান বিশ্বজনীন তারাই ঠকেছে। সুতরাং জ্ঞানপাপীদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত করা প্রয়োজন জাতীয়তাবাদের স্বার্থে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন আসবেনা প্রকৃত কৃষককে তার শ্রমলব্ধ ফসলের আদর্শমূল্য নিশ্চিত না করতে পারলে আর কৃষি ক্ষেত্রের গবেষণাকে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনার সাথে যুক্ত করতে না পারলে, শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত মুনাফাকারী footloose সংস্থার মাধ্যমে অর্থবহ পরিবর্তন আসবে না। শ্রমিকের স্বার্থকে রক্ষা করে তার ব্যবহারিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ না করতে পারলে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে পারে না একজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুকরণ ও তত্ত্বীয় দিক পরিহার করে উদ্ভাবন ও ব্যবহারিক মানসিকতা সৃষ্টি প্রয়োজন, শ্রমের মর্যাদাদান অপরিহার্য, সৃজনশীলতার মূল্যায়ন অত্যাবশ্যকীয় এবং সমাজ সম্পৃক্ততা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ সংস্থার ক্ষেত্রে

বিদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ না করলে জাতীয় সৃজনশীল প্রয়োজনগুলো অগ্রাধিকার পায় না, সঞ্চয় মনোবৃত্তিও গড়ে উঠে না। দেশজ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মূল শর্ত হল এ থেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিস্ফুটভাবে জনগণের অভিজ্ঞান যে তারাও তাদের পরিমন্ডল আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাবে। জনবিচ্ছিন্ন শহরাশ্রয়ী মধ্যসত্বভোগী সরকার, বুদ্ধিজীবী, আমলা, বিজ্ঞানী এ পরিবর্তন আনতে অসমর্থ, কারণ তারা অতি সহজেই দাতাদের শিক্ষার কারণ তাদের পণ্য তাদের হাটেই বিকায়। এ থেকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাও কোন ব্যতিক্রম নয়। এদেশের অতীত আছে যেখানে সমস্যাও ছিল সাফল্যও ছিল, এদেশে ঔপনিবেশিক আমলের আগে জনসমর্থিত শিক্ষাও ছিল এবং বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছিল যার মূল কথা ছিল মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক গঠন ও শিক্ষাকে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের ও আত্মত্যাগী চরিত্র গঠনের বাহন করে তোলা। আমরা সে ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছি। তাই সংবিধানে যতই জাতীয়তাবাদ থাকুক, এ বিশ্লেষণ নিয়ে যতই বির্তক করি না কেন এর প্রয়োগিক দিকে অগ্রসর না হয়ে আমাদের পশ্চাদগমন ঘটেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার তা কখনই হতে পারে না, সেকারণে মুক্তিযুদ্ধ যারা জাতীয় আত্মবিকাশে বিশ্বাসী তাদের জন্য আজও অসম্পূর্ণ এবং ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যারা হারিয়ে গেছেন বা মুনাফা লুটেছেন তাদের আবার নতুন প্রজন্মের প্রকৃত মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষেতে খামারে কলকারখানায় পরনির্ভর সুবিধাবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে জাতীয় আত্মবিকাশের স্বার্থে। না হলে এদেশ কেবল পরনির্ভরশীল থাকবে, পদানত থাকবে, হতমান ও মর্যাদাহীন হয়েই থাকবে। আমার প্রজন্ম ব্যর্থ হয়েছে। আগামী প্রজন্ম যে আছে মাটির আর মানুষের কাছাকাছি, আমি তার লাগি কান পেতে আছি।